Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XV, Issue-I, October 2026, Page No. 71-81
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi, Assam, India
Website: http://www.thecho.in
DOI: 10.64031/pratidhwanitheecho.vol.15.issue.01W.136

দেবেশ রায়ের উপন্যাসচিন্তায় মিখাইল বাখতিন: প্রভাব, অনুষঙ্গ ও সমালোচনা

শতাব্দী কর, *গবেষক, বাংলা বিভাগ, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ভারত*

Received: 21.10.2026; Accepted: 28.10.2026; Available online: 31.10.2026
©2026 The Author(s). Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

This article explores the ideas of Debesh Roy and Mikhail Bakhtin on the nature and form of the novel. Roy, a prominent Bengali novelist, short story writer, and essayist, has referred ato Bakhtin's ideas on the novel in several of his essays and discussions on the genre. These repeated references provide an important reason to examine the ideas of the two thinkers together. For Roy, the novel is more than a form of storytelling; it is a way of exploring human life, social reality, and the historical position of individuals. Bakhtin, a Russian literary critic and theorist, also challenged conventional ideas of the novel, emphasizing its multiple voices, dialogic nature, and social use of language. While their approaches share certain similarities, they also reveal important differences. Through a comparative reading of their ideas, this article aims to explore Roy's distinctive understanding of the novel, examine its points of agreement and disagreement with Bakhtin's theory, and consider the possible influence of Bakhtin on Roy's literary thought.

Keywords: Debesh Roy, Mikhail Bakhtin, Novel Theory, Dialogism, Monologism, Polyphony

উপন্যাস শিল্পরূপের স্বরূপ, নির্মাণপদ্ধতি এবং সামাজিক ইতিহাস ও মানব জীবনের সঙ্গে এর সম্পর্ক নিয়ে বাংলা সাহিত্যে স্বতন্ত্রভাবে নিজের চিন্তাভাবনা প্রকাশ করেছেন সাহিত্যিক দেবেশ রায়। একাধারে ছোটগল্পকার, ঔপন্যাসিক ও প্রাবন্ধিক দেবেশ রায়ের কাছে উপন্যাস কেবল কাহিনি বর্ণনা নয়; বরং মানুষের জীবন, সমাজবাস্তবতা এবং মানব ইতিহাসে ব্যক্তির ঐতিহাসিকতা ইত্যাদির অনুসন্ধান। তাই উপন্যাসের প্রচলিত ধারণা ও রীতিকে প্রশ্ন করার মধ্য দিয়ে তিনি এই সাহিত্যরূপটির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অন্বেষণ করেছেন। ফলে দেবেশ রায়ের উপন্যাসচিন্তা শুধু তাঁর সাহিত্যকর্মের ব্যাখ্যায় নয়, বাংলা উপন্যাসের স্বরূপ অনুধাবনের ক্ষেত্রেও বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। উপন্যাস সম্পর্কে দেবেশ রায়ের এই ভাবনাকে আরও গভীরভাবে বুঝতে গেলে স্বাভাবিকভাবেই রাশিয়ান সাহিত্য তাত্ত্বিক ও সমালোচক মিখাইল বাখতিনের (১৮৯৫-১৯৭৫) উপন্যাসতত্ত্বের প্রসঙ্গ এসে পড়ে। দেবেশ রায় তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধে ও উপন্যাস সংক্রান্ত নানান আলোচনায় মিখাইল বাখতিনের উপন্যাসচিন্তার প্রসঙ্গ এনেছেন। বাখতিনের কাছে উপন্যাস এমন এক সাহিত্যরূপ যা বিভিন্ন সামাজিক ভাষা, দৃষ্টিভঙ্গি ও কণ্ঠস্বরের পারস্পরিক সন্নিবেশ ঘটায়। তাঁর আলোচনায় উপন্যাসের বহুস্বরিকতা, সংলাপধর্মিতা এবং ভাষার সামাজিক চরিত্র বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। অন্যদিকে, দেবেশ রায়ও উপন্যাসের প্রচলিত সংজ্ঞার সীমা অতিক্রম করে তার রূপ, প্রকৃতি ও সম্ভাবনা সম্পর্কে নিজস্ব ধারণা গড়ে তুলেছেন। এই দুই চিন্তকের

উপন্যাসভাবনার মধ্যে কোথাও সাদৃশ্য, কোথাও পার্থক্য, আবার কোথাও তাত্ত্বিক সংযোগের সম্ভাবনা লক্ষ করা যায়। তবে দেবেশ রায়ের উপন্যাসচিন্তাকে কেবল বাখতিনের তত্ত্বের আলোকে ব্যাখ্যা করাই এই আলোচনার উদ্দেশ্য নয়। বরং দুই চিন্তকের ভাবনার তুলনামূলক পাঠের মধ্য দিয়ে দেবেশ রায়ের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি, বাখতিনের তত্ত্বের সঙ্গে তার মিল-অমিল এবং দেবেশ রায়ের উপন্যাসভাবনায় বাখতিনীয় চিন্তার সম্ভাব্য প্রভাব বিচার করাই এই প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য।

মিখাইল বাখতিন বিংশ শতাব্দীর অন্যতম প্রভাবশালী সাহিত্যতাত্ত্বিক ও সমাজচিন্তক। তাঁর লেখা রচনাগুলির মধ্যে অন্যতম হল 'Problems of Dostoevsky's Art' (১৯২৯), 'Rabelais and His World' (১৯৬৫), 'The Dialogic Imagination: Four Essays' (১৯৮১), 'Speech Genres and Other Late Essays' (১৯৮৬) ইত্যাদি। বাখতিনের বিভিন্ন রচনা প্রকাশের বহু বছর পর সেগুলি ইংরেজীতে অনুবাদের মাধ্যমে বিশ্বের পাঠকদের কাছে পৌঁছেছে। তবে বাখতিনের বহু রচনা তাঁর জীবদ্দশায় প্রকাশিত হয়নি; মৃত্যুর পর সেগুলি সংকলিত ও প্রকাশিত হয়। এমনকি অনেক রচনার সম্পূর্ণ উদ্ধার করাও সম্ভব হয়নি। এছাড়াও তাঁর চিন্তাভাবনার বড় অংশই আমরা ইংরেজি অনুবাদের মাধ্যমে জানতে পারি। ফলে তাঁর তত্ত্বের বহু দিক এখনও সম্পূর্ণভাবে আলোচিত হয়নি। তাই বাখতিনের চিন্তাভাবনা বুঝতে হলে তাঁর ব্যবহৃত নির্দিষ্ট ধারণা ও পরিভাষার ভিত্তিতেই আলোচনা করা প্রয়োজন। (Chattopadhyay, 'Lecture 12: Dialogism and Polyphony', ২) সাহিত্যতত্ত্বে তাঁর চিন্তার স্বাতন্ত্র্যের কারণে বাখতিনকে রুশ 'ফর্মালিজম' কিংবা 'পোস্ট-স্ট্রাকচারালিজমে'র কোনো নির্দিষ্ট তাত্ত্বিক ধারার মধ্যে সীমাবদ্ধ করা যায় না। দেবেশ রায়ের মতে, উপন্যাস শিল্পরূপের আলোচনায় জর্জ লুকাচের 'The Theory of the Novel' (১৯১৬) এবং 'The Historical Novel' (১৯৩৭) বা আয়ান ওয়াটের 'The Rise of the Novel: Studies in Defoe, Richardson and Fielding' (১৯৫৭)-এর মত আলোচনা উপন্যাস সাহিত্যের ইতিহাসে নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ, কিন্তু তাঁদের আলোচনায় উপন্যাস শিল্পরূপ হিসেবে উপন্যাসের স্বরূপ নির্ধারণের প্রশ্নটি যথাযথভাবে আলোচিত হয়নি। দেবেশ রায় মনে করেন, এই গ্রন্থগুলিতে উন্যাসের স্বরূপ নিয়ে আলোচনার পরিবর্তে উপন্যাসের বহিরঙ্গ বৈশিষ্ট্যসমূহের ওপর অধিক জোড় দেওয়া হয়েছে। তাই উপন্যাসের প্রকৃত স্বরূপ খুঁজতে তিনি বাখতিনের উপন্যাসতত্ত্বের গুরুত্ব স্বীকার করেছেন:

> "উপন্যাসের শিল্পরূপ সম্পর্কে বাখতিনের ছাড়া আর কারও কোনো তত্ত্ব নেই। লুকাচ বা আয়ান ওয়াট-এর মত বিপরীতধর্মী তাত্ত্বিকের আলোচ্য উপন্যাসের উপকরণের বিশ্লেষণ, উপন্যাসের সত্তানির্ধারণ নয়। লুকাচ-এর 'থিওরি অব দি নভেল বা ওয়াটের 'দি রাইস অব দি নভেল' এ এই উপকরণ বিন্যাসেরই নানা রকমফের- সে-রকমফের নিশ্চয়ই আলোচকদের দার্শনিক প্রস্থানের ওপর নির্ভরশীল।" (রায়, 'উপন্যাস নিয়ে' ৪৫)

দেবেশ রায় মনে করে, বাখতিনের প্রাসঙ্গিকতা এখানেই যে, তিনি পূর্বনির্ধারিত কোনো তত্ত্ব উপন্যাসের ওপর চাপিয়ে দেন নি; বরং উপন্যাসের মধ্য থেকেই উপন্যাসের স্বরূপ বোঝার চেষ্টা করেছেন। এভাবেই বাখতিন উপন্যাসের বাহ্যিক উপাদানের চেয়ে তার অন্তর্নিহিত শিল্পধর্মের ওপর অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। (৪৫)

মিখাইল বাখতিনের জন্ম ১৮৯৫-তে রাশিয়ার ওরেল শহরে। পরবর্তী জীবনে তিনি দীর্ঘ সময় ভিলনিয়াস ও ওডেসায় কাটিয়েছিলেন। এই দুই অঞ্চলের বহুভাষিক ও বহুসাংস্কৃতিক পরিবেশ তাঁর চিন্তাজগৎকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। শৈশব থেকেই রুশ ভাষার পাশাপাশি জার্মান ভাষায়ও তাঁর দক্ষতা ছিল। ভিলনিয়াসে বসবাস শুরু করার পর বিভিন্ন ভাষার সঙ্গে তাঁর পরিচয় আরও বিস্তৃত হয়। যদিও সেখানে সরকারি ভাষা ছিল রুশ, তবে স্থানীয় অধিবাসীদের অধিকাংশই পোলিশ অথবা লিথুয়ানীয় ভাষায় কথা বলতেন। পরবর্তীকালে

বন্দরনগরী ওডেসায় থাকার সময় তরুণ বাখতিনের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সম্প্রদায়ের মানুষের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ ঘটে। মাইকেল হলকুইস্ট তাঁর 'Dialogism: Bakhtin and His World' (১৯৯০) গ্রন্থে বাখতিনের জীবনে এই বহুভাষিক ও বহুসাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতার গুরুত্ব তুলে ধরেছেন। পরবর্তী সময়ে বাখতিনের 'বহুস্বর' ধারণার বিকাশের সঙ্গে এই অভিজ্ঞতার সম্পর্ক রয়েছে বলে সেখানে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। (Chattopadhyay, 'Lecture 12: Dialogism and Polyphony' ৩)

১৯২৯-এ বাখতিনের 'Problems of Dostoevsky's Art' লেখাটি প্রকাশিত হয়। এরপর পরই বাখতিনের বিরুদ্ধে ধর্মীয় ও দার্শনিক আলোচনাচক্রের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে তৎকালীন সোভিয়েত রাষ্ট্রের রাজনৈতিক দমননীতি এবং ধর্মীয়-দার্শনিক বুদ্ধিজীবীদের ওপর নজরদারির প্রেক্ষাপটে ভিত্তিতে মিখাইল বাখতিনকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারের পর বাখতিনকে সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্গত কাজাখস্তানের একটি প্রত্যন্ত অঞ্চলে নির্বাসনে পাঠানো হয়। নির্বাসিত জীবনে তিনি উপন্যাসের সাহিত্যিক রূপ ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণামূলক কাজ সম্পন্ন করেন। এর মধ্যে কিছু রচনা পরবর্তীকালে ইংরেজি অনুবাদে সংকলিত হয়ে 'The Dialogic Imagination' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ১৯৩০-এর দশকের শেষভাগ থেকে ১৯৪০-এর দশকের গোড়ার দিকে বাখতিন আরও দুটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করেন। প্রথমটি ছিল 'Bildungsroman' বা বিকাশমূলক উপন্যাস সম্পর্কে তাঁর গবেষণা, যার কেবল কিছু অংশই বর্তমানে পাওয়া যায়। দ্বিতীয়টি ছিল বিখ্যাত ফরাসি লেখক ফ্রাঁসোয়া র‍্যাবেলে (১৪৯৪-১৫৫৩) সম্পর্কে তাঁর গবেষণাপত্র। ১৯৪১-এ তিনি এই কাজটি ম্যাক্সিম গোর্কি ইনস্টিটিউট অফ ওয়ার্ল্ড লিটারেচারে ডক্টরেট ডিগ্রির জন্য জমা দেন। দীর্ঘ বিতর্কের পর ইনস্টিটিউট শেষ পর্যন্ত গবেষণাটি অনুমোদন করে। পরবর্তীকালে এই গবেষণাই 'Rabelais and His World' (১৯৬৫) নামে প্রকাশিত হয়। (৩) এবারে বাখতিনের বিশেষ কয়েকটি ধারণা নিয়ে আলোচনা করব।

'পলিফোনি':

বাখতিনের উপন্যাসতত্ত্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ধারণা হল 'পলিফোনি' (Polyphony)। সংগীতের জগৎ থেকে নেওয়া এই শব্দটি এমন এক সুরবিন্যাসকে বোঝায়, যেখানে একাধিক স্বতন্ত্র সুর একসঙ্গে বাজে। (৩) রুশ ঔপন্যাসিক দস্তয়েভস্কির (১৮২১-১৮৮১) 'Problems of Dostoevsky's Poetics' (১৯৬৩) গ্রন্থে বাখতিন উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে এই ধারণাটি ব্যবহার করেছেন। তাঁর মতে, দস্তয়েভস্কির উপন্যাসে একাধিক স্বাধীন কণ্ঠস্বর ও চেতনা পাশাপাশি অবস্থান করে। তাঁর উপন্যাসে প্রতিটি চরিত্রের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও স্বতন্ত্র জগৎ রয়েছে; কোনো একটি কেন্দ্রীয় স্বর বা লেখকের একক কণ্ঠস্বর অন্য সব কণ্ঠকে নিয়ন্ত্রণ বা গ্রাস করে না। এই বহুস্বরিকতার মধ্য দিয়ে বাখতিন উপন্যাসের এমন এক রূপ তুলে ধরেন, যেখানে বিভিন্ন চেতনা পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত হলেও নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখে। বাখতিন এই ধারণার সাহায্যে দস্তয়েভস্কির (১৮২১-১৮৮১) রচনার বিশ্লেষণ করেছেন এবং পরবর্তীতে এই ধারণা বাখতিনের চিন্তায় আরও ব্যাপক তাৎপর্য অর্জন করেছে, এই প্রসঙ্গে বাখতিন লিখেছেন:

> "A plurality of independent and unmerged voices and consciousnesses, a genuine polyphony of fully valid voices is in fact the chief characteristic of Dostoevsky's novels. What unfolds in his works is not a multitude of characters and fates in a single objective world, illuminated by a single authorial consciousness; rather a plurality of consciousnesses, with equal rights and each with its own world, combine but are not merged in the

> unity of the event. Dostoevsky's major heroes are, by the very nature of his creative design, not only objects of authorial discourse but also subjects of their own directly signifying discourse." (Bakhtin, 'Problems of Dostoevsky's Poetics', ৬-৭)

অর্থাৎ বাখতিনের মতে, দস্তয়েভস্কির উপন্যাসের মূল বৈশিষ্ট্য হলো একাধিক স্বতন্ত্র কণ্ঠস্বর ও চেতনার সহাবস্থান। উপন্যাসের প্রতিটি কণ্ঠস্বর নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র এবং কেন্দ্রীয় কণ্ঠস্বরের পাশাপাশি সমান গুরুত্ব বহন করে। এখানে লেখক কোনো সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ থেকে চরিত্রদের ব্যাখ্যা করে তাদের চিন্তা ও অবস্থানকে নিজের বক্তব্যের অধীন করেন না। বরং প্রত্যেক চরিত্রের নিজস্ব চেতনা, মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গি স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশিত হয়। এই চেতনাগুলি একই আখ্যানের মধ্যে পাশাপাশি অবস্থান করলেও পরস্পরের সঙ্গে মিশে গিয়ে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য হারায় না। তবে বাখতিন এমনও সতর্ক করে দিয়েছেন যে, অনেক উপন্যাসে একাধিক কণ্ঠস্বর থাকলেই তাকে 'বহুস্বর' বলা যাবে না। এমন অনেক উপন্যাস রয়েছে যেখানে বহু চরিত্রের সমাগম হলেও চরিত্রেরা লেখকের বা কেন্দ্রীয় স্বরের অনুগামী হওয়ায় বহুচেতনার সাক্ষাৎ মেলে না। এই ধরণের রচনাকে বাখতিন 'মনোলজিজম' (monologism) হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। (৮০)

উপরিউক্ত 'মনোলজিজমে'র পরিবর্তে দস্তয়েভস্কির উপন্যাসে চরিত্ররা কেবল লেখকের বক্তব্যের বাহক নয়; তারা নিজেরাই কথা বলে, নিজেদের চিন্তা প্রকাশ করে এবং নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির মধ্য দিয়ে অর্থ নির্মাণ করে। ফলে উপন্যাসে কোনো একটি মত বা কণ্ঠস্বর অন্য সব কণ্ঠস্বরকে নিয়ন্ত্রণ করে না; বরং বিভিন্ন মত, চিন্তা ও চেতনা পাশাপাশি সক্রিয়ভাবে অবস্থান করে। বাখতিন এই স্বতন্ত্র কণ্ঠস্বর ও চেতনার সহাবস্থানকেই 'বহুস্বর' বা 'পলিফোনি' ধারণার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেছেন। অর্থাৎ এখানে কেবল বহুস্বর নয় একইসঙ্গে বহু চেতনার পাশাপাশি অবস্থানের কথা বলা হয়েছে। দস্তয়েভস্কির উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্রের পারস্পরিক কথোপকথন ও নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির মধ্য দিয়ে অর্থ নির্মাণ করেন, এই ধরণের রচনাকে বাখতিন 'মনোলজিজম'-এর বিপরীতে 'ডায়ালোজিজম' (dialogism) বলেছেন। (৮) বাখতিনের এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যের খোঁজেই বাখতিন পাড়ি জমিয়েছেন সুদুর অতীতে, এমনকি মহাকাব্য, নাটক ও প্যারোডির মতো বিভিন্ন সাহিত্যরূপের ইতিহাসেও বাখতিন উপন্যাসের সম্ভাবনা খুঁজে পেয়েছেন। বাখতিন উপন্যাসের এই আদিরূপের সমাহারের প্রক্রিয়াকে 'নভেলাইজেশন' বলেছেন। (রায়, 'উপন্যাস নিয়ে' ৪৮) এই প্রসঙ্গে দেবেশ রায় মন্তব্য করেছেন:

> "বাখতিন সক্রেটিসকে প্রায় আদি-ঔপন্যাসিক বলে ফেলেন তাঁর কথোপকথনের ভঙ্গির জন্যে, তাঁর সেই ভঙ্গিতে প্রতিপক্ষের যুক্তিকে নিজের যুক্তি হিশেবে উপস্থিত করার সচেতন ভঙ্গির জন্যে, একা তাঁর কণ্ঠস্বরেই একটি বিষয়ের বহু পক্ষ তৈরির ক্ষমতার জন্যে। বাখতিন যখন আধুনিক কালে আসেন তখন তিনি ইবসেন-এর নাটকে, বায়রন-এর নাটকে দীর্ঘ কাব্য 'চাইল্ড হেরাল্ড' ও 'ডন জুয়ান'-এ হাইনের লিরিকে 'নভেলাইজেশন' খুঁজে পান।" (৪৮)

এই 'নভেলাইজেশন'-এর সর্বোত্তম উদাহারণ হল দস্তভস্কির উপন্যাস। এই প্রক্রিয়ায় কেবল উপন্যাস নয়, মহাকাব্য, নাটক ও প্যারোডিকেও উপন্যাসের অংশ বিশেষ হিসেবে পড়া যায়। এমনকি বাখতিন আধুনিককালে নাটক, দীর্ঘকাব্য ইত্যাদিতেও 'নভেলাইজেশন'-এর প্রক্রিয়া খুঁজে পেয়েছেন।

'কার্নিভালেস্ক':

'কার্নিভালেস্ক'-এর (Carnivalesque) ধারণাটি বাখতিনের উপন্যাসতত্ত্বের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। 'কার্নিভাল' (carnival) থেকে উদ্ভূত 'কার্নিভালেস্ক'-এর ধারণার সঙ্গে মধ্যযুগীয় ইউরোপের উৎসব-সংস্কৃতির সম্পর্ক রয়েছে। (Chattopadhyay, 'Lecture 13: Dialogism: Heteroglossia, Carnivalesque and

Chronotope' ২-৩) বাখতিন লক্ষ করেছেন, কার্নিভালের হাস্যরস ও ব্যঙ্গ চরিত্র প্রচলিত সামাজিক নিয়ম, রীতিনীতি, নানান বিধি-নিষেধ, কর্তৃত্ব এবং শ্রেণিবিন্যাসকে সাময়িকভাবে উল্টে দিতে পারত। এর ফলে সমাজের প্রতিষ্ঠিত শৃঙ্খলা প্রশ্নের মুখে পড়ত এবং বিকল্প নানান সামাজিক সম্পর্কের সম্ভাবনা তৈরি হতো। 'Rabelais and His World'- গ্রন্থে বাখতিন এই প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন:

"... carnival celebrated temporary liberation from the prevailing truth and from the established order; it marked the suspension of all hierarchical rank, privileges, norms, and prohibitions." (Bakhtin, 'Rabelais and His World' ১০)

পরবর্তীকালে ইউরোপে নবজাগরণের আবির্ভাব, রাষ্ট্রব্যবস্থায় পরিবর্তন ও রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের আঁটসাঁট নিয়মকানুন চালু হলে 'কার্নিভালগুলি' ধীরে ধীরে পথঘাট থেকে সঙ্কুচিত হতে থাকে। এতে 'কার্নিভালে'র ধ্বংসাত্মক সম্ভাবনাগুলি নিয়ন্ত্রিত হলেও 'কার্নিভালে'র নানান বৈশিষ্ট্যগুলি প্যারোডি, ব্যঙ্গ ও সাহিত্যের অন্যান্য রূপের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়। (Chattopadhyay, 'Lecture 13: Dialogism: Heteroglossia, Carnivalesque and Chronotope' ২-৩) বাখতিনের মতে, উপন্যাস এমন একটি সাহিত্যরূপ, যা কার্নিভালের প্রবণতাকে ধারণ করে প্রচলিত মূল্যবোধ ও সামাজিক কর্তৃত্বকে প্রশ্ন করতে পারে। মহাকাব্যের তুলনায় উপন্যাসের এই স্বাতন্ত্র্য তাকে নতুন সামাজিক বাস্তবতা ও প্রতিষ্ঠিত শ্রেণিবিন্যাসের সমালোচনার উপযুক্ত মাধ্যম করে তুলেছে।

বাখতিন দস্তয়েভস্কির উপন্যাসের সঙ্গে মধ্যযুগীয় রোমাঞ্চকাহিনিরও কিছু সাদৃশ্য লক্ষ করেছেন। উভয় ক্ষেত্রেই নায়কেরা নানান অস্বাভাবিক পরিস্থিতি ও অপ্রত্যাশিত ঘটনার মুখোমুখি হয়, উভয়েই ব্যক্তিগতভাবে ও সামাজিক ভাবে দায়-দায়িত্বহীন হয়ে ঘুরে বেড়াতে পারে। তবে দুই ধরনের নায়কের মধ্যে মৌলিক পার্থক্যও যথেষ্ট রয়েছে। রোমাঞ্চকাহিনির নায়কেরা নানা বিপদ ও পরিস্থিতির মোকাবিলা করলেও দস্তয়েভস্কির নায়কেরা প্রায়শই সেগুলির সঙ্গে সরাসরি সংঘর্ষে না গিয়ে আত্মরক্ষা করার চেষ্টা করে। দেবেশ রায়ের আলোচনায় উদ্ধৃত বাখতিনের বক্তব্য অনুসারে, দস্তয়েভস্কির উপন্যাসে রোমাঞ্চকাহিনির বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে খ্রিষ্টীয় সাধু-সন্তদের স্বীকারোক্তিমূলক ভঙ্গিও মিশে যায়। এর ফলে অস্বাভাবিক ও সংকটপূর্ণ পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে প্রচলিত বিশ্বাস, নৈতিকতা, দর্শন এবং সামাজিক মূল্যবোধের পরীক্ষা সম্ভব হয়।

দেবেশ রায় মনে করেন, লিরিক, এপিক ও ট্র্যাজেডির মতো সাহিত্যরূপের নিজস্ব ও প্রতিষ্ঠিত শিল্পরীতি রয়েছে। সাধারণত উপন্যাসের কোনো অংশকে কাব্যিক বা নাটকীয় বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে বিচার করা হলেও, দেবেশ রায়ের মতে, এই পদ্ধতিতে উপন্যাসের স্বতন্ত্র শিল্পরূপকে যথাযথভাবে বোঝা সম্ভব নয় কারণ এতে ওই উল্লিখিত শিল্পরূপগুলিকেই বিচার করা হয়। তাই দেবেশ রায় বাখতিনের সঙ্গে এই বিষয়ে একমত যে, উপন্যাসে ঔপন্যাসিক সচেতনভাবে বিভিন্ন কণ্ঠস্বর ও ভাষার ব্যবহার ঘটিয়ে একটি বিশেষ কাঠামো নির্মাণ করেন। এখানে শব্দের প্রচলিত অর্থ সম্পূর্ণ বদলে যায় না; বরং তার মূল অর্থ বজায় রেখেই তাকে ভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় উপন্যাসের বহুস্বরিকতা গড়ে ওঠে। দেবেশ রায় মনে করেন, উপন্যাসের এই স্বতন্ত্র গঠনপদ্ধতির কারণেই তাকে লিরিক, এপিক বা নাটকের শিল্পরীতির মাপকাঠিতে বিচার করা যায় না। এছাড়াও উপন্যাস নিজের শিল্পরূপের প্রয়োজনেই সাহিত্যের নানান প্রকরণ থেকে কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করেছে। বাখতিনও তাই উপন্যাসের স্বরূপ অনুসন্ধান করতে গিয়ে প্রচলিত সাহিত্যরূপের সীমা অতিক্রম করে মধ্যযুগীয় রোমান্স ও প্যারোডির মতো আখ্যানরীতির দিকে ফিরে গেছেন। দেবেশ রায় লিখেছেন: "বাখতিন তাঁর উপন্যাসের ইতিহাস খোঁজেন সাহিত্যের স্বীকৃত ইতিহাসের বাইরেই শুধু নয়, তার বিপরীত প্রক্রিয়ায়, বা এমনকী বলা যায় সেই স্বীকৃত ইতিহাসের অবমূল্যায়নে- মধ্যযুগীয় নাইটদের রোমান্সের বা

রাখালিয়া কাব্য- আখ্যানের বা আবেগমন্থনের কাহিনীর প্যারডিতে। সার্ভেন্তিস-এ, স্টার্ন-এ বা ফিল্ডিং-এ এই 'প্যারডি'র সঙ্গে আমাদের দেখা হয় বটে কিন্তু বাখতিন আমাদের জানান- এ-প্যারডি চলে আসছে সেই গ্রিক আদিকাল থেকেই। কখনো স্বীকারোক্তিতে, কখনো কখনো কল্পকথায়, কখনো প্রবল ব্যঙ্গবিদ্রুপে- এই 'নভেলাইজেশন' ঘটে আসছে।" (রায়, 'উপন্যাস নিয়ে' ৪৮)

দেবেশ রায় উপন্যাসের শিল্পরূপ ও আঙ্গিকগত বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণের মধ্যেই কেবল নিজের আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখেননি, উপন্যাস কীভাবে একটি স্বতন্ত্র সাহিত্যরূপ হিসেবে গড়ে ওঠে, তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলি কী এবং অন্যান্য সাহিত্যরূপ থেকে তাকে কীভাবে পৃথক করা যায়—এই প্রশ্নগুলির পাশাপাশি বাংলা উপন্যাসের ঐতিহাসিক উৎস ও পূর্ববর্তী আখ্যান-পরম্পরার অনুসন্ধানও তাঁর চিন্তায় বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস কেবল একটি নতুন সাহিত্যরূপের আবির্ভাবের ইতিহাস নয়; বরং পূর্ববর্তী আখ্যান-পরম্পরার সঙ্গে তার সম্পর্ক, বিচ্ছেদ এবং রূপান্তরের ইতিহাসও।

এই অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে দেবেশ রায় বাখতিনের উপন্যাসতত্ত্বের সাহায্য গ্রহণ করেছেন। বাখতিন উপন্যাসকে এমন একটি সাহিত্যরূপ হিসেবে দেখেছেন, যার মধ্যে বিভিন্ন সামাজিক ভাষা, দৃষ্টিভঙ্গি, কণ্ঠস্বর এবং আখ্যানরীতি পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে। উপন্যাসের এই বহুমাত্রিক প্রকৃতিকে সামনে রেখে দেবেশ রায় বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগীয় আখ্যানগুলির দিকে ফিরে তাকিয়েছেন। বিশেষত মঙ্গলকাব্যের বর্ণনাপদ্ধতি, কাহিনি নির্মাণের ধরন, চরিত্রের উপস্থাপনা এবং আখ্যানের মধ্যে বিভিন্ন কণ্ঠস্বরের উপস্থিতি বিচার করে তিনি বাংলা উপন্যাসের পূর্বসূত্র অনুসন্ধানের চেষ্টা করেছেন। তাঁর কাছে এই অনুসন্ধানের তাৎপর্য শুধু আধুনিক উপন্যাসের সঙ্গে প্রাচীন আখ্যানের কিছু বাহ্যিক সাদৃশ্য চিহ্নিত করা নয়; বরং পূর্ববর্তী সাহিত্যরীতির মধ্যে এমন আখ্যানের সম্ভাবনা খুঁজে দেখা, যা পরবর্তী সময়ে উপন্যাসের বিকাশকে বুঝতে আমাদের সাহায্য করতে পারে।

দেবেশ রায় মধ্যযুগীয় বাংলা আখ্যানধারার মধ্যে উপন্যাসের সম্ভাব্য উৎস অনুসন্ধান করতে গিয়ে লক্ষ করেছেন যে, বাংলা সাহিত্যে মঙ্গলকাব্য, চৈতন্যজীবনী এবং পরবর্তী পালাগানগুলিতে কাহিনি ও চরিত্রের মধ্যে বিভিন্ন 'নতুন অভিঘাত, ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার'১৮ মাধ্যমে এক ধরনের আখ্যান-বিবরণীচর্চার বিকাশ ঘটেছিল। (২৫) তাঁর মতে, এই আখ্যানরীতিগুলির মধ্যে বাংলা উপন্যাসের পূর্বসূত্র খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। দেবেশ রায়ের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, মঙ্গলকাব্য ও চৈতন্যজীবনী রচনার ক্ষেত্রে লেখকেরা সাধারণত একটি নির্দিষ্ট কাঠামো অনুসরণ করতেন, যাকে তিনি 'স্টেরিওটাইপ' নামে অভিহিত করেছেন। এই পূর্বনির্ধারিত কাঠামোই রচনাগুলির 'ফর্ম' হিসেবে কাজ করত। (২৬) উদাহরণ হিসেবে মঙ্গলকাব্যের দেবখণ্ড ও নরখণ্ডের কথা বলা যায়। দেবখণ্ডে সৃষ্টিতত্ত্বসহ বিভিন্ন পৌরাণিক বিষয় ও জিজ্ঞাসার বিবরণ থাকে, অন্যদিকে নরখণ্ডে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থ রচনার কারণ বা উৎপত্তির প্রেক্ষাপট বর্ণিত হয়। মঙ্গলকাব্যে এই দুটি অংশের মধ্যে কবিদের সংযোগও বজায় রাখতে হত। দেবখণ্ডের কাহিনির সঙ্গে নরখণ্ডের সম্পর্ক স্থাপনের মধ্য দিয়ে আখ্যানের ধারাবাহিকতা রক্ষিত হতো এবং কাহিনির গতিপথও একটি নির্দিষ্ট কাঠামোর মধ্যে আবদ্ধ থাকত।

দেবেশ রায়ের মতে, কবির আত্মজীবনীমূলক বিবরণ কিংবা গ্রন্থ রচনার কারণ ব্যাখ্যা করার মধ্য দিয়ে মঙ্গলকাব্যের আখ্যানকারদের নিজস্ব বিবরণের সংযোজন এবং কাহিনিতে 'নতুন অভিঘাত' সৃষ্টির সুযোগ থাকলেও এই অংশে উপন্যাসের সূত্র খুঁজে পাওয়া যাবে না। একইভাবে, নরখণ্ডের মূল কাহিনিতে বিভিন্ন চরিত্রের বর্ণনা ও বিবরণের মধ্য দিয়েও অনুসন্ধান সম্ভব নয়। তবে দেবেশ রায় মনে করেন, এই প্রত্যক্ষ বর্ণনার সীমা অতিক্রম করে মঙ্গলকাব্যের দেবখণ্ডে কাহিনিকারদের বিবরণের মধ্যে উপন্যাসের একটি অন্তর্নিহিত বা 'গোপনপাঠ' আবিষ্কার করা যায় মূল দেবকাহিনির অন্তরালে। এই প্রসঙ্গে দেবেশ রায় লিখেছেন:

"আমাদের অনুমান- মঙ্গলকাব্যগুলির দেবখণ্ডেই কাহিনীকারের বিবরণের একটা গোপন পাঠ আবিষ্কার করা যায় মূল দেবকাহিনীর অন্তরালে। সেখানে পৌরাণিক কাহিনীর একটি অচেতন প্যারডির সঙ্গে মিশে যেত পৌরাণিকতার এক সমালোচনা। কাহিনীকারের বিবরণে পৌরাণিকতার বিবরণ ভেঙে যেতে থাকে আর সেই ভাঙনের ভিতর থেকেই সমালোচনার বিবরণটি বেরিয়ে আসে। তাতে হিন্দু পুরাণের দ্বারা সমর্থিত দেবদেবীর বংশপরিচয় লোপ পায়, লোভ পেতে-পেতে শেষে বিপর্যস্ত হয়ে যায় আর সেই বিপর্যয়ের ভিতর কে যে কার বাবা আর কে যে কার স্বামী, কে যে কার স্ত্রী আর কে যে কার মা- সেই সম্পর্ক খুঁজে বের করা প্রায় দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। এমনকি দেবদেবীদের অপ্রাকৃত ক্ষমতাও প্রায় সব সময় ব্যবহৃত হয় তুচ্ছ সব কারণে।" (২৯)

দেবেশ রায়ের মতে, দেবখণ্ড ও নরখণ্ড এই দুই অংশের মধ্যে সংযোগ বজায় রাখার প্রয়োজন থাকলেও, দেবখণ্ডে কাহিনিকার তুলনামূলকভাবে বেশি স্বাধীনতা পেতেন। দেবেশ রায়ের মতে, উপন্যাসের সম্ভাব্য সূত্র অনুসন্ধান করতে গেলে নরখণ্ডের নির্দিষ্ট কাহিনির তুলনায় দেবখণ্ডের এই স্বাধীনতার দিকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।

বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের 'মনসাবিজয়' কাব্যের দেবখণ্ড বিশ্লেষণ করে দেবেশ রায় দেখিয়েছেন, প্রচলিত পৌরাণিক কাহিনির আড়ালেও কাহিনিকারের নিজস্ব বিবরণ একটি ভিন্ন পাঠের সম্ভাবনা তৈরি করতে পারে। দেবেশ রায়ের মতে, এই আখ্যানের শুরুতেই গঙ্গা ও শিবের পৌরাণিক সম্পর্কের ধারাবাহিকতা ভেঙে দেওয়া হয়েছে। বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের 'মনসাবিজয়' অবলম্বনে মহর্ষি শান্তনুর আশ্রয় থেকে শিব তাঁর স্ত্রী গঙ্গাকে দেবতাদের অসুরবিজয় উপলক্ষে যজ্ঞের রান্নার কাজে নিয়ে আসেন। তবে শান্তনু এই শর্তে তাঁকে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেন যে, গঙ্গা রাতে দেবতাদের আশ্রয়ে থাকবেন না। (পিপিলাই, 'মনসামঙ্গল' ৭) কিন্তু শেষ পর্যন্ত গঙ্গা রাতে ফিরে যেতে পারেন না এবং মহর্ষি শান্তনুও গঙ্গাকে আর গ্রহণ করেন না। ফলে গঙ্গাকে শিবের আশ্রয়েই থেকে যেতে হয়। এরপর শিবের গৃহে দৈবক্রমে গঙ্গার সঙ্গে ধর্মের সাক্ষাৎ হয়। এই ঘটনার পর উপস্থিত সকলে গঙ্গার প্রশংসা ও স্তব করতে থাকেন। সবার কাছ থেকে এমন সম্মান ও সমাদর পেয়ে গঙ্গা আনন্দে আপ্লুত হন এবং শিব তাঁকে সস্নেহে নিজের মস্তকে স্থান দেন। এর পর আখ্যান থেকে গঙ্গাদেবীর উপস্থিতি কার্যত হারিয়ে যায়। তারপর কাহিনীকার সম্পূর্ণ নিজস্ব এক বিবরণে শিবের জটা দিয়ে গঙ্গার মর্তে আগমনের পৌরাণিক কাহিনীটির বিবরণ দিলেন, এতেই ঘটনার পৌরাণিক আবরণ ভেঙে গিয়েছে। (৭)

মঙ্গলকাব্যের লৌকিক জনপ্রিয়তার কারণে এই কাহিনিগুলি লিখিত রূপ পাওয়ার আগেই লোকসমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। তাই নরখণ্ডে কাহিনিকারকে অনেক বেশি নির্দিষ্ট আখ্যানরীতি অনুসরণ করতে হয়েছে। ফলে চরিত্রগুলির জীবন ও ঘটনাপ্রবাহের একটি পূর্বনির্ধারিত রূপ ছিল, যা থেকে কাহিনিকার সহজে সরে আসতে পারতেন না। অবশ্য বিভিন্ন কবি তাঁদের বিবরণ, চরিত্রচিত্রণ ও বাস্তব জীবনের প্রসঙ্গ উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ করেছেন। সাহিত্যের ইতিহাসে মুকুন্দরাম চক্রবর্তীকে মঙ্গলকাব্যের শ্রেষ্ঠ কবিদের একজন হিসেবে বিবেচনা করার পেছনে এই শিল্পকৃতির ভূমিকা রয়েছে। এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশকালে ই. বি. কাওয়েল মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর 'চণ্ডীমঙ্গলে'র প্রভূত প্রশংসা করেছিলেন তাঁর 'কল্পনার বাস্তবতা' ও বর্ণনার জন্য। এমনকি তিনি মুকুন্দরাম চক্রবর্তীকে ঔপন্যাসিক ওয়াল্টার স্কটের (১৭৭১-১৮৩২) সঙ্গেও তুলনা করেছেন। (সেন, 'চণ্ডীমঙ্গল' ৪৭-৪৮) অন্যদিকে 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' গ্রন্থে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন:

> "বঙ্গদেশের লৌকিক ধর্মসাহিত্য, ইহার চন্ডী ও মনসার কাব্যে, বাস্তবচিত্রগুলি আরস্ফুট ও প্রসারিত হইয়া চলিয়াছে। ইহাদের অলৌকিক আখ্যান গুলি ক্রমশঃ ক্ষীণতর হইয়া কাব্যের অপ্রধান অংশে পরিণত হইয়াছে ও কেবল অতীতের ধারার সহিত যোগসূত্র অক্ষুন্ন রাখিবার

> উপায়মাত্রে পর্যবসিত হইয়াছে। দেবতা মানুষের অধীন হইয়াছেন- দেবকীর্তিবর্ণনা উজ্জ্বল বাস্তব চিত্রের নিকট নিষ্ক্রম হইয়া পড়িয়াছে। এই শ্রেণীর প্রধান কাব্য মুকুন্দরামের 'কবিকঙ্কন-চণ্ডী'তে স্ফুটোজ্জ্বল বাস্তবচিত্রে, দক্ষচরিত্রাঙ্কনে, কুশল ঘটনাসন্নিবেশে, ও সর্বোপরি, আখ্যায়িকা ও চরিত্রের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম ও জীবন্ত সম্মন্ধস্থাপনে, আমরা ভবিষ্যৎকালের উপন্যাসের বেশ সুস্পষ্ট পূর্বাভাস পাইয়া থাকি। ... দক্ষ উপন্যাসিকের অধিকাংশ গুণই তাঁহার মধ্যে বর্তমান ছিল। এযুগে জন্মগ্রহণ করিলে তিনি যে কবি না হইয়া একজন উপন্যাসিক হইতেন তাহাতে সংশয় মাত্র নাই।" (বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' ১১)

তবে দেবেশ রায় মনে করেন, কেবল এই বিবরণী-কুশলতার ভিত্তিতে মঙ্গলকাব্যের নরখণ্ডে আধুনিক উপন্যাসের উৎস খোঁজা ঠিক হবে না তাতে মধ্যযুগীয় আখ্যানের ওপর আধুনিক উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য আরোপ করার আশঙ্কা তৈরি হয়:

> "উপন্যাসের বাস্তবতা, চরিত্রগঠন, কাহিনীনির্মাণের সেই আধুনিক অভিজ্ঞতাকেই যদি মঙ্গলকাব্যের উপর আরোপ করা যায় তা হলে মঙ্গলকাব্যের ভিতর থেকেই কোনো নাট্যকার আধুনিক নাটকের উপাদান খুঁজে পেতে পারেন। কোন উপন্যাসিক আধুনিক উপন্যাসের উপাদান আবিষ্কার করতে পারেন। কিন্তু আমরা তো খুঁজছি মঙ্গলকাব্যের ভিতরই কাহিনীকারের বিবরণ কোথায় সঞ্চারিত হয়ে যেত সেই জায়গাটি, কাহিনীকারের বিবরণ প্রক্ষেপের সেই জায়গাটি থেকে উপন্যাসের আলাদা কোনো ধরণ তৈরি হয়ে উঠতে পারতো কী না তার সম্ভাবনা।" (রায়, 'উপন্যাস নিয়ে' ২৯)

দেবেশ রায় মনে করেন, বরং নরখণ্ডের তুলনায় দেবখণ্ডে বিভিন্ন কবির স্বাধীনতা তুলনামূলকভাবে বেশি। দেবখণ্ডের কাহিনি থেকে দেবতা বা দেবী নরখণ্ডের আখ্যানে প্রবেশ করলেও, সেই সংযোগ সব সময় কোনো নির্দিষ্ট নিয়মে পরিচালিত হয়নি। ফলে এই অংশে বিভিন্ন কবি নিজেদের মতো করে দেবদেবীর কাহিনি ও সৃষ্টিতত্ত্ব নির্মাণ করেছেন।

মঙ্গলকাব্যে যেমন দেবদেবীর কৃপালাভে অনুগ্রহপ্রাপ্ত মানুষের জীবনকাহিনি প্রধান হয়ে ওঠে, ঠিক এর বিপরীতে চৈতন্যজীবনীর কেন্দ্রে রয়েছেন স্বয়ং ভগবানের অবতার হিসেবে বিবেচিত চৈতন্যদেব। তাঁর জন্মের আগেই ভক্তদের মধ্যে তাঁর অবতারত্ব সম্পর্কে বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত ছিল। দেবেশ রায় মনে করেন, তাই চৈতন্যজীবনীর রচয়িতাদের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল তাঁর ভাগবত অবতারের প্রামাণিকতা রক্ষা করা। এই বিশ্বাসের কারণেই নতুন নতুন ঘটনার বিবরণের মধ্য দিয়ে কবিরা চৈতন্যদেবের জীবনের আখ্যান গড়ে তুলেছেন। চৈতন্যজীবনীর সঙ্গে মঙ্গলকাব্যের অন্যতম পার্থক্য হল আঞ্চলিকতার সীমা অতিক্রম করার ক্ষমতা। মঙ্গলকাব্যের লৌকিক দেবদেবীদের পূজা ও ভক্তির পরিসর মূলত বঙ্গদেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু চৈতন্যদেবের কাছে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল ও সমাজের নানা স্তর থেকে ভক্তদের সমাগম ঘটেছিল। তাঁদের জীবন ও চৈতন্যের সঙ্গে সম্পর্কের বিবরণ চৈতন্যআখ্যানকে বৃহত্তর সামাজিক পরিসর দিয়েছে:

> "কারো জন্ম নবদ্বীপে কারও চাটিগ্রামে।
> কেহো রাঢে ওড্র দেশে শ্রীহট্টে পশ্চিমে।।
> নানা স্থানে অবতীর্ণ হৈল ভক্তগণ।
> নবদ্বীপে আসি হইল সবার মিলন।।
> ...
> গঙ্গা-তীর পুণ্য স্থান সকল থাকিতে।

বৈষ্ণব জন্ময়ে কেন শোচ্য দেশেতে।।
আপনে হইলা অবতীর্ণ গঙ্গা-তীরে।
সঙ্গের পার্ষদ কেন জন্মায়েন দূরে।।
যে যে দেশে গঙ্গা-হরিনাম-বিবর্জ্জিত।
যে দেশে পাণ্ডব নাহি গেলা কদাচিত।।
সে সব জীবেরে কৃষ্ণবৎসল হইয়া।
মহাভক্ত সব জন্মায়েন আজ্ঞাদিয়া।।" (দাস, 'শ্রীশ্রীচৈতন্য-ভাগবত' ১৮)

এই গ্রন্থে বহু মানুষের সমাবেশ, তাদের জীবন ও সম্পর্কের বিবরণ এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বাচনের ব্যবহার আখ্যানটিকে বহুমাত্রিক করে তুলেছে। এই প্রসঙ্গে দেবেশ রায় 'বহুস্বর' বা 'পলিফনি'র গুরুত্বের কথা বলেছেন। চৈতন্যদেবের ভক্তদের বিচিত্র জীবনকাহিনি এবং তাঁদের সঙ্গে চৈতন্যের নানা সম্পর্কের মধ্য দিয়ে এই বহুস্বর তৈরি হয়েছে। (রায়, 'প্রবন্ধ সংগ্রহ' ৩৬৬) তবে দেবেশ রায় এমনও মনে করেন যে, উপন্যাসে যেমন চরিত্রের বিকাশ দেখানো হয় চৈতন্যজীবনীতে তা সম্ভব হয়নি। এর কারণ, চৈতন্যদেবের জীবনকে ঘিরে গড়ে ওঠা ধর্মীয় মহিমাই এই আখ্যানের উপন্যাসধর্মী সম্ভাবনাকে অনেকাংশে সীমাবদ্ধ করেছে। চৈতন্যদেবের জীবনের ঘটনাগুলি একটি নির্দিষ্ট ধারাবাহিকতা মেনে সাজানো হয়েছে—জন্ম ও বাল্যকাল থেকে কৈশোর, যৌবন, বিবাহ ও পিতৃবিয়োগ; গয়ায় যাত্রা এবং সেখান থেকে ভাবাবিষ্ট হয়ে ফিরে আসা; কৃষ্ণভক্তদের সঙ্গে সংকীর্তনে যোগদান; সন্ন্যাস গ্রহণ; তারপর নীলাচলে অবস্থান, দাক্ষিণাত্য ও বৃন্দাবন ভ্রমণ, বঙ্গদেশে প্রত্যাবর্তন এবং জীবনের শেষ পর্ব। এই ঘটনাপ্রবাহের মধ্য দিয়ে চৈতন্যদেবের আধ্যাত্মিক রূপান্তর ও ভক্তিজীবনের ক্রমপরিণতি তুলে ধরা হয়েছে। ফলে আখ্যানের কেন্দ্রে ব্যক্তিমানুষের জটিল জীবনসংগ্রামের চেয়ে তাঁর ধর্মীয় সাধনা ও ভাবাবেশই বেশি গুরুত্ব পেয়েছে।

তবে দেবেশ রায়ের মত অনুযায়ী, চৈতন্যের জীবনের বাহ্যিক ঘটনাগুলির বিবরণে উপন্যাসের কিছু লক্ষণ খুঁজে পাওয়া সম্ভব। কারণ, একজন মানুষের অন্তর্জগৎ কেবল তাঁর আধ্যাত্মিক উপলব্ধির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না; দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা, পারিবারিক সম্পর্ক, সামাজিক পরিস্থিতি এবং অন্য মানুষের সঙ্গে দ্বন্দ্ব-সংঘাত-প্রেম-ভালোবাসার মধ্য দিয়েও তা প্রকাশিত হয়। চৈতন্য-আখ্যানের বহির্জীবনসংক্রান্ত অংশে এই ধরনের অভিজ্ঞতার কিছু পরিচয় মেলে। সেখানে শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়ার মতো চরিত্রের উপস্থিতি যেমন চৈতন্যদেবের ব্যক্তিগত জীবনের অন্য দিক উন্মোচন করেছে, তেমনই নানা ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় চৈতন্যদেবের বিরক্তি, ক্রোধ কিংবা মানসিক অস্থিরতার প্রকাশ তাঁকে মানবিক চরিত্র হিসেবেই পাঠকের সামনে নিয়ে আসে। কখনো জনসমক্ষে সংকীর্তনের নেতৃত্ব দেওয়া, আবার কখনো নিভৃত একাকিত্বের আকাঙ্ক্ষা—এই বিপরীত প্রবণতাগুলির মধ্য দিয়ে চৈতন্যদেবের ব্যক্তিসত্তার বিভিন্ন দিক প্রকাশিত হয়েছে। দেবেশ রায়ের অনুসন্ধানে এই বহির্জীবনই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এখানেই ধর্মীয় জীবনীকেন্দ্রিক আখ্যানের নির্ধারিত কাঠামোর বাইরে চরিত্র, অভিজ্ঞতা ও মানসিক প্রতিক্রিয়ার বিস্তৃততর উপস্থাপনার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। এছাড়াও দেবেশ রায় বৈষ্ণব কবিদের রচনাতেও 'বহুস্বরে'র আরেকটি উৎস লক্ষ করেছেন। চৈতন্যআখ্যানের পরবর্তী কবিরা পূর্ববর্তী কবিদের রচনার প্রশংসা করেছেন, নিজেদের কাব্যে পূর্ববর্তী কবিদের নাম উল্লেখ করেছেন এবং তাঁদের কাব্যের বিবরণ নিজেদের রচনায় ব্যবহারও করেছেন। ফলে একই ঘটনা একাধিক কবির বর্ণনায় ভিন্ন ভিন্ন স্বর ও দৃষ্টিভঙ্গি লাভ করেছে। যেমন 'চৈতন্য ভাগবতে'র আদিখন্ডে কবি বৃন্দাবন দাস লিখেছেন:

"আদিদেব জয় জয় নিত্যানন্দ রায়।
চৈতন্যমহিমা স্ফুরে যাহার কৃপায়।।

চৈতন্যকৃপায় হয় নিত্যানন্দে রতি।
নিত্যানন্দ জানিলে আপদ নাহি কতি।।"(দাস, 'শ্রীশ্রীচৈতন্য-ভাগবত' ৮০)

এই বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আধুনিক উপন্যাসের বহুস্বরিকতার সঙ্গে তুলনা করার সুযোগ রয়েছে। তবে দেবেশ রায় মনে করেন, চৈতন্যজীবনীতে চৈতন্যদেবই প্রধান ও কেন্দ্রীয় চরিত্র হওয়ায় উপন্যাসের মতো স্বতন্ত্র তৃতীয় কণ্ঠস্বরের পূর্ণ বিকাশ সম্ভব হয়নি। চৈতন্যদেবের চরিত্রে ঈশ্বরত্বের ধারণা তাঁর চরিত্রের প্রচলিত উপন্যাসসুলভ বিকাশেরও সীমা নির্ধারণ করেছে। তাই দেবেশ রায় চৈতন্যজীবনীকে সরাসরি আধুনিক বাংলা উপন্যাসের উৎস হিসেবে গ্রহণ করেননি। প্রায় এক শতাব্দী ধরে চৈতন্যআখ্যান বাংলা সাহিত্যে একটি স্বতন্ত্র শাখা হিসেবে বিকশিত হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে এই শাখা ক্রমশ রীতিনির্ভর হয়ে পড়ে এবং বৈষ্ণব ধর্মীয় সম্প্রদায়ের অনুসরণীয় গ্রন্থের রূপ লাভ করে। ফলে এর বিবরণী-সম্ভাবনা একটি নির্দিষ্ট ধর্মীয় কাঠামোর মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে যায়।

দেবেশ রায় মধ্যযুগীয় আখ্যানরীতির বিবর্তনের সূত্র খুঁজেছেন উনিশ শতকের প্রথমার্ধের খেউড়, কবিগান ও তরজার মধ্যেও। এই প্রসঙ্গে দেবেশ রায়ের মত বিশেষ উল্লেখযোগ্য, তাঁর মতে, মঙ্গলকাব্য, চৈতন্যজীবনী ও পালাগানে গড়ে ওঠা আখ্যানের প্রচলিত ছাঁচ কথকের নিজস্ব ব্যাখ্যা ও বিবরণের মাধ্যমে বারবার নতুন রূপ পেয়েছে। মঙ্গলকাব্যে বা চৈতন্যজীবনীতে বিভিন্ন ঘটনার খণ্ডাংশ, তত্ত্বের ব্যাখ্যা এবং কথকের ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি মিলিয়ে আখ্যানের মধ্যে যে বহুস্বর তৈরি হয়, তা উপন্যাসের সম্ভাব্য পূর্বসূত্র হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। উনিশ শতকের কলকাতার কবিগান, খেউড় ও খেমটার মধ্যে এই পুরনো আখ্যানরীতির কিছু অবশেষ টিকে থাকলেও, ঔপনিবেশিক প্রভাব ও শহুরে সংস্কৃতির পরিবর্তনের চাপে সেগুলিও ক্রমশ বিলুপ্ত হতে থাকে। (রায়, 'উপন্যাস নিয়ে' ২৭) এভাবেই দেবেশ রায় বাংলা উপন্যাসের সম্ভাব্য উৎস অনুসন্ধান করতে গিয়ে মধ্যযুগীয় আখ্যানের গঠন, কথকের স্বাধীনতা, বিবরণের বৈচিত্র্য ও বহুস্বরের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন।

দেবেশ রায় বাংলা উপন্যাসের উদ্ভবকে কেবল ইউরোপীয় উপন্যাসের প্রভাবের ফল হিসেবে ব্যাখ্যা করতে নারাজ। তিনি উপন্যাস শিল্পরূপকে বাংলা সাহিত্যের নিজস্ব ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক পরিসরের সঙ্গে যুক্ত করে দেখতে চেয়েছেন। তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গিতে আধুনিক উপন্যাসের আবির্ভাবের পূর্বে বাংলা সাহিত্যে প্রচলিত বিভিন্ন আখ্যানরীতির মধ্যে উপন্যাসের সম্ভাব্য বৈশিষ্ট্য অনুসন্ধানের প্রবণতা লক্ষ করা যায়। এই উদ্দেশ্যে তিনি বাখতিনের উপন্যাস তত্ত্বের সাহায্য নিয়েছেন ঠিকই কিন্তু অতিরিক্ত ইউরোপীয় তত্ত্ব প্রয়োগেরও সমান বিরোধীতা করেছেন। যে কোনো তত্ত্বকেই দেবেশ রায় যুক্তিযুক্ত পদ্ধতিতে বিচার না করে গ্রহণ করতে রাজী ছিলেন না। এর ফলে বাংলা উপন্যাসের ইতিহাসকে কেবল পাশ্চাত্য সাহিত্যরীতির গ্রহণ ও অনুসরণের প্রয়াস হিসেবে না দেখে, দেশীয় আখ্যান-পরম্পরার সঙ্গে আধুনিক সাহিত্যরূপের পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করেছেন। বাখতিনের তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে দেবেশ রায়ের এই অনুসন্ধানের সংযোগ এখানেই বিশেষ তাৎপর্য লাভ করেছে।

তথ্যসূত্র:

১. Chattopadhyay, Sayan. 'Lecture 12: Dialogism and Polyphony'. NPTEL, IIT Kanpur, July- September, 2022. Link: https://drive.google.com/file/d/12z3_WY-metUC9f0SWW14UPZYqekRNi0y/view
২. রায়, দেবেশ। 'উপন্যাস নিয়ে''। তৃতীয় সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, সেপ্টেম্বর, ২০১৬।

৩. Bakhtin, Mikhail. 'Problems of Dostoevsky's Poetics'. (Edited and translated by Caryl Emerson), University of Minnesota Press, 1984.

৪. Chattopadhyay, Sayan. 'Lecture 13: Dialogism: Heteroglossia, Carnivalesque and Chronotope'. NPTEL, IIT Kanpur, July- September, 2022. Link: https://drive.google.com/file/d/1IOAduBtLFp31rw7uZ0ywzByD0CURD_VV/view

৫. Bakhtin, Mikhail. 'Rabelais and His World'. Translated by Hélène Iswolsky, Indiana University Press, Bloomington, 1984.

৬. পিপিলাই, বিপ্রদাস। 'মনসামঙ্গল''। সম্পাদক অচিন্ত্য বিশ্বাস, প্রথম প্রকাশ, রত্নাবলী, কোলকাতা, ১৪০৯।

৭. সেন, সুকুমার (সম্পাদিত)। 'চণ্ডীমঙ্গল''। প্রথম প্রকাশ, সাহিত্য অকাদেমি, ১৯৭৫।

৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশ্রীকুমার। 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা'। মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৮৪।

৯. দাস, বৃন্দাবন। 'শ্রীশ্রীচৈতন্য-ভাগবত''। Link https://dn760105.eu.archive.org/0/items/in.ernet.dli.2015.353327/2015.353327.Sri-Sri.pdf

১০. রায়, দেবেশ। 'প্রবন্ধ সংগ্রহ''। (সমরেশ রায় এবং স্বপন পাণ্ডা সম্পাদিত) এবং মুশায়েরা, কলকাতা, ২০১৮।